দ্বিতীয় অধ্যায়

মানিক দত্ত : কবি কথা

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। স্রষ্টার ব্যক্তিগত পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান ও সময় সৃষ্টি-প্রতিমা রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে মধ্যযুগের স্রষ্টাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি উদ্‌ঘাটন করা একটু দুরূহ ব্যাপার। তবুও কবিরা স্বীয় কাব্যের মধ্যে নিজেদের পরিচয়-জ্ঞাপক সামান্য কিছু তথ্য রেখে যেতেন। এরূপ অতিসংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের কারণ হয়তো সেই সময়ের— (ক) কবির তুলনায় কবির সৃষ্টির প্রতি পাঠক ও শ্রোতাদের প্রবল আগ্রহ ছিল। (খ) ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠী তথা সমাজের প্রাধান্য অনেক বেশি ছিল। কবি নিজেকে ব্যক্ত করার উৎকণ্ঠা থাকলেও শ্রোতা বা পাঠকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য করে তা করে উঠতে পারতেন না। হয়তো এই কারণে মধ্যযুগের কবিরা নিজের আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক কোন গ্রন্থ লিখে যেতে পারেননি। কিন্তু মধ্যযুগের কাব্যগুলি নিয়ে সমকালের কোন কবি-সাহিত্যিক বা কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি তেমন ভাবে সমালোচনা করেননি, যেখানে আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের মত মধ্যযুগের লেখক পরিচিতি উঠে আসবে। যেটুকু বা উঠে এসেছে তা সম্পূর্ণ কবি-পরিচিতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রূপকার কানা হরি দত্ত সম্বন্ধে বিজয় গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লেখ এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তী মানিক দত্তের কথা নামমাত্র উল্লেখ ইত্যাদি। তাতে কবি-পরিচয় বলতে যা বোঝায় তা পাওয়া যায় না। তাই কবিদের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে তাঁদের স্বীয় কাব্যেই বিচরণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে কবি পরিচয়ের দু'টি আশ্রয়স্থল বেছে নিতে হয়— (এক) গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশ এবং (দুই) পদশেষে ভণিতা অংশ।

প্রসঙ্গত, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান ও মধ্যযুগেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তি অংশে নিজের ব্যক্তি পরিচয়ের সঙ্গে মানিক দত্তের ব্যক্তি পরিচয় বিক্ষিপ্ত ভাবে দিয়েছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর উল্লেখ থেকে জানতে পারা যায় যে, মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি। তাঁর উল্লেখ থেকে কবি মানিক দত্তের পরিচয়টুকু নেওয়া যাক্। তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'দিগ্‌দেবতাবন্দনা' অংশে মানিক দত্তের প্রতি বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন—

> "মানিক দত্তের দাণ্ডা করিএ বিনয়।
> যাহা হৈতে হৈল্য গীত পথে পরিচয়।।"[১]

কবি মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সকল ভণিতায় নিজের সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ

করেছেন। কাব্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ও প্রসঙ্গক্রমে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় তিনি অশিক্ষিত ছিলেন। তিনি কানা ও খোঁড়া, অর্থাৎ প্রতিবন্ধী ছিলেন। দেবী চণ্ডীর কৃপায় তাঁর বিকলাঙ্গ দূর হয়।

''মানিক দত্তের শিরে নাথীকার ঘা।
কানা খোড়া দূর গেল দিব্ব্য হৈল গা।।''[২]

হয়তো পেশায় তিনি গায়েন ছিলেন। কবি দোহার ও তম্বুর বা তানপুরা বাজনার সঙ্গে গ্রাম-গ্রামান্তরে চণ্ডীর গান করতেন। তিনি রঘু ও রাঘব নামক দুই দোহার বা পালিকে নিয়ে কলিঙ্গে চণ্ডীর গান করতে এসেছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার বর্ণনা এইরূপ—

''তম্বুর বায়ন তথা দিল দরশন।
রঘু রাঘব পালী আইল দুইজন।।
তিন চারি জনে তবে সম্প্রদা করিল।
কলিঙ্গ নগরে দত্ত আসি উত্তরিল।।''[৩]

এই কলিঙ্গ নগরের রাজার কাছে কবি নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সেখানে তিনি 'প্রফুল্লনগর'-এ তাঁর বাসগৃহের কথা বলেছেন। আবার দেবী চণ্ডীর কাছে তার সহচরি পদ্মা কবির বাসস্থান 'ফুলফুল্যানগর'-এর কথা প্রকাশ করেছে। অনেক বিদগ্ধ সমালোচক এই দুটি স্থানের অবস্থান বর্তমান মালদহ শহরে অবস্থিত বলে অনুমান করেছেন। তাই আগে কবির বাসস্থান যে মালদহ জেলায় তা প্রমাণ করব। অতঃপর মালদহ জেলায় প্রফুল্লনগর বা ফুলফুল্যানগরের অবস্থান প্রমাণ করব। সেই জন্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রফুল্লনগর ও ফুলফুল্যানগরের নাম যুক্ত উদ্ধৃতি যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। আমরা সর্বপ্রথম এই সকল সমালোচকের মন্তব্যগুলি তুলে ধরছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্মী ও 'আদ্যের গম্ভীরা'র রচয়িতা হরিদাস পালিত সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রথম কবি মানিক দত্তের পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন— ''মানিক দত্তের চণ্ডী একটু ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, কবিকে মালদহের লোক বলিয়াই বোধ হয়। পুরাতন মালদহের নিকটবর্ত্তী কোন ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন গ্রামদিতে তাঁহার নিবাস ছিল।''[৪]

বিখ্যাত গবেষক-অধ্যাপক ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন (জানুয়ারি, ১৯০০—৩ মার্চ, ১৯৯২) বলেছেন— ''কাব্যের পুথি উত্তরবঙ্গের। উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করিয়া মালদহ অঞ্চলে এই পাঁচালী গান এখনও প্রচলিত আছে।''[৫]

বাংলা সাহিত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ব্যাখ্যাকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৩ জুন, ১৯২০—১৬ মে, ২০০৩) বলেছেন — ''.... এখনও মালদহে এই কাব্য উৎসব অনুষ্ঠানে গীত বা পঠিত হইয়া থাকে। .... কবি মালদহের অধিবাসী ...।''[৬]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ের সমালোচক সনৎকুমার মিত্রের (৩০ জুন, ১৯৩৩?) কথায় — ''এই কাব্যধারার যিনি আদি কবি হিসেবে পরিচিত তাঁর নাম মানিক দত্ত। (আ: খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী)। তিনি ছিলেন প্রাচীন গৌড় বা মালদহ জেলার অধিবাসী।''[৭]

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯ জানুয়ারি, ১৯০৯—১৯ মার্চ, ১৯৮৪) বলেছেন— ''মানিক দত্তের রচনা পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক। তাঁহার কাব্য এখনও মালদহ অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। তাহাতে যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা সমস্তই মালদহ বা গৌড়ের সন্নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত।''[৮]

পরবর্তীকালে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সম্পাদক সুনীলকুমার ওঝা বলেছেন— ''মানিক দত্তের ভাষায় যে আঞ্চলিক শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ মালদহ জেলা, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পশ্চিমাংশে প্রচলিত। ... মানিক দত্ত যে সমাজ পরিবেশে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন সে সমাজে মুসলমান রাজত্বের ফলে বিশেষতঃ রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বসবাসহেতু প্রচুর পরিমাণে ইসলামিক শব্দের ব্যবহার ঘটিয়েছে।''[৯]

অন্যদিকে, 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থের রচনাকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— ''মঙ্গলচণ্ডীর একজন কবি মানিক দত্ত গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন; তিনি কাব্যের নায়ককে মোড় গাঁ দিয়া ছেতেভেতের বিল পার করাইয়া গৌড়ে আনিয়াছেন।''[১০]

ভূদেব চৌধুরীর (৩০ জুলাই, ১৯২৪?) কথায়— ''মানিক দত্তের পুথির সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায়, তিনি ফুলুয়া নগরের অধিবাসী ছিলেন। অনেকে এই ফুলুয়া মালদহ জেলার বর্তমান ফুলবাড়ি বলে নির্দেশ করে থাকেন। কবির রচনাংশ সমূহ মালদহ জেলা থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া কাব্যে বর্ণিত অনেক স্থান মালদহ জেলাতেই অবস্থিত।''[১১] উক্ত সকল সমালোচক কবি মানিক দত্তের বাসস্থান মালদহ জেলার কথা মেনে নিয়েছেন। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে সমস্ত স্থান-নাম ও পথ বর্ণনা রয়েছে তার ভিত্তিতে এইসব বক্তব্যের স্পষ্টতা নির্ধারণ করার চেষ্টা রয়েছে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি বা বণিক খণ্ডে ধনপতি শারি-শুয়ার জন্য স্বর্ণ পিঞ্জর তৈরী করতে উজানী থেকে গৌড়ের উদ্দেশ্যে স্থলপথে রওনা হয়। প্রসঙ্গত, উজানী নগর বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। ধনপতি গৌড় থেকে পিঞ্জর নিয়ে ফেরার পথে বনগ্রাম, সিমলা নগর ও শীতলপুর নামক স্থানের উল্লেখ আছে। বনগ্রাম ও শীতলপুর মালদহের হাবিবপুর থানায় অবস্থিত। মালদহের District Census Hand Book -এ হাবিবপুর থানার অন্তর্গত বনপুর ও শীতলপুর গ্রাম দুটির নাম উল্লেখ রয়েছে— (১) "Adampur, Agra,

Aharail ... Banchhair, Bankail, Bishnupur, **Banpur**, Barail, Basantepur ..."[১২] এবং (২) "Sadapur, Saidpur, Sahapur, Sankail ... **Sitalpur**, Soladang, Srikrishnapur, Sripur..."[১৩]। আর পথ নির্দেশ অনুযায়ী সিমলা নগর মালদহের এই দুই গ্রামের মাঝামাঝি কোন গ্রাম হওয়া সম্ভব। আবার ধনপতি গৌড় থেকে উজানী নগরে ফেরার সময় জলপথে রওনা হয়েছিল। নদীপথের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানের নাম মানিক দত্ত উল্লেখ করেছেন।

''ডাহিন বামের গ্রামে এড়াইল দূর।
খোস বাজার এড়াইল নামে বিষ্ণুপুর।।
সমুখে গৌউড়ি গঙ্গা তাহা হৈল পার।
বাহাদূরপুরে জাঞা কৈল ফলাহার।।
তাহার পশ্চাত চলিল শঙ্খেশ্বর।
দিতীএ মজিলে বাসা কৈল ব্রহ্মপুর।।
তাহার পশ্চাতে চলিল গণকর।
সেখানে বাসা জাঞা রহিল সদাগর।।''[১৪]

যেমন - বিষ্ণুপুর মালদহের রতুয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম। মালদহের District Census Hand Book -এ এর পরিচয় রয়েছে— "Ailpara, Alpara, Amarrinha, Andirampara ... Bhaluara, Bihari, Bijra Bhita, Bisal Gokul, **Bishnupur**, Chandi Prasad, Chandipur, Chandpur ..."[১৫]। খোস বাজার সম্ভবত গৌড়ের বাইশ বাজার বলে সন্দেহ করেছেন মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সম্পাদক সুনীলকুমার ওঝা। তিনি বলেছেন— ''খোস বাজার সম্ভবতঃ গৌড়ের বাইশ বাজারেরই একটি হইবে ...।''[১৬] মালদহ জেলার সম্মুখ দিয়ে বয়ে যাওয়া গৌরী গঙ্গা (খুব সম্ভবত গৌড়ের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত সুপ্রাচীন নদী) ও বাহাদুরপুর ইংলিশ থানার অন্তর্গত গ্রাম। তার পরিচয় পাই মালদহের District Census Hand Book -এ "Abhirampur, Anandamohanpur, Anandipur, Arapur ... Badulyabari, Bagbari, **Bahadurpur**, Balupur, Bara Chak..."[১৭]। এবং সুনীলকুমার ওঝা বলেছেন— ''গৌড়ীগঙ্গা খুব সম্ভব গৌড়ের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত সুপ্রাচীন নদীটি। ইংলিশবাজার থানায় বাহাদুরপুর নামে একটি মৌজা এখনও আছে— উহা গৌড়ী গঙ্গার নিকটেই। গৌড়ীগঙ্গাকে বর্ত্তমানে লোকে ভাগীরথীই বলিয়া থাকে।''[১৮] ব্রহ্মপুরের বর্তমান নাম বহরমপুর; এটি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। L.S.S.O' Malley বলেছেন— "The name Berhampore is an English transferation of the vernacular name Bahrampur, the derivation of which is explained as follows by Mr. Beveridge : "Berhampore (Baharampur)

seems to be a corruption of the Hindu name of the place --- Brahmapur, i.e., the city of Brahma."[১৯]। গণকর মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার একটি রেলস্টেশন। সুনীলকুমার ওঝা বলেছেন— ''... গণকর এখনও আছে ঐ নামেই ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় অবস্থিত একটি রেলওয়ে স্টেশন।''[২০] মুর্শিদাবাদের District Census Hand Book -এ গণকর স্থানটিকে জঙ্গীপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেখানো হয়েছে— "Elaspur, Enayelnagar, Frasernagar, Gadaipur, **Gankar**, Gankar Chak, Ghorsala..."[২১]। কারণ ধনপতির বিবাহের সময় চার রাজ্যে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়। সেই চার রাজ্য হল— উজানী, ইছানী, মঙ্গলকোট ও অবন্তী।

''উজানি ইছানি অবন্তি মঙ্গলকোট
চারিরার্য্যেত গুয়া গেল।''[২২]

মঙ্গলকোট ও উজানী বর্ধমান জেলায় এখনও অবস্থিত। ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ বলেছেন— ''উজানি নগরে লক্ষপতি ধনপতি সদাগরের বাস ছিল। এই হল সেই উজানি-নগর, বর্তমান কোগ্রাম যার একাংশ মাত্র। .... বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার অর্ন্তগত উজানি-কোগ্রাম (কোঁগা নামে পরিচিত)।''[২৩] রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— ''ঈশানী বাইছানী, উজানি, চাঁপাই— এই সকল বণিক -প্রধান স্থান ছিল। বর্ত্তমান মঙ্গলকোট, কোগ্রাম, নূতনহাট, পুরাতন হাটী প্রভৃতি প্রাচীন উজ্জয়িনী বা উজানীর স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। কোগ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান ইছাবর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রাচীন ঈশানী বা ইছানীর অন্তর্গত। চাঁপাই বা চম্পকনগর এখন বর্দ্ধমান জেলার অধীন।''[২৪] অবন্তী হয়তো তারই নিকটবর্তী কোন স্থান। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ধনপতি গৌড়ের বিষ্ণুপুর থেকে গঙ্গার পাস ফিরে বাহাদুর হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রহ্মপুর ও গণকর হয়ে বর্ধমানের উজানী নগরে পৌঁছায়।

ধনপতি দ্বিতীয়বার উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরের অনুরোধে চন্দন আনতে দক্ষিণপাটনে বা সিংহলে যায়। উজানী নগরের ভ্রমরাঘাট থেকে জলপথে তার যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রা পথে যেসকল স্থানের নাম মানিক দত্ত উল্লেখ করেছেন তা হল— অমুয়ামুলুক, কোদালিয়ার ঘাট, নদীয়া শান্তিপুর, ভীমঘাট, কুমারপুর, মগরা, ইন্দ্রানী নগর, সপ্তগ্রাম, কড়িদহ, রত্নমালার ঘাট এবং সবশেষে সিংহল। আম্বুয়ামুলুক ছিল মধ্যযুগের বিখ্যাত শ্রীচৈতন্য সময়ের কাজীর শাসনাধীন অঞ্চল; এটি বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— ''সমুদ্রগড়, আম্বুয়ামুলুক (কাল্না), শান্তিপুর, উলা, গুপ্তিপাড়া ও হালিশহরের নাম পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবতে অন্ত্য খণ্ডে আছে, এই স্থান হইতে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগরুভিমুখী হইয়াছেন। চৈতন্যদেব এখানে অম্বুলিঙ্গনামে শিবমূর্ত্তি দর্শন করেন। এখন ছত্রভোগের নিকট গঙ্গার খাতের কেবল চিহ্নমাত্র

আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা বহু গ্রন্থে মগরার খালের নাম পাওয়া যায়। মগরার জলাবর্ত্তে পড়িয়া অনেক সদাগরের বাণিজ্যতরি ডুবিয়া গিয়াছিল। এ মগরা এখনকার রেলওয়ে ষ্টেশন মগরা হইতে ভিন্ন।''[২৫] কুমারপুর মালদহ জেলার ইংলিশবাজার থানার একটি গ্রাম। মালদহের District Census Hand Book -এ রয়েছে— "Jagadispur, Jamalpur, ... Kaltapara, Kamalpur ... Krishnapur, **Kumarpur**, Kutubpur Phulbari..."[২৬]। এছাড়া ইন্দ্রানীনগর বর্ধমান জেলায়, নদীয়ার শান্তিপুরের উল্লেখ রয়েছে। মধ্যযুগের সপ্তগ্রাম, মগরা হুগলী জেলার বিখ্যাত স্থান।

এছাড়াও সওদাগর ধনপতি গৌড়ে আসার সময় মোড়গ্রাম স্নান করে ছেতেভেতে বিল পার হয়—

''রাজার আরতি সদাগর গঠিবারে সুবর্ণ পিঞ্জর
ছাড়ি বান্যা নিজ উজিয়ানি।
মোড়গ্রামে করি স্নান রন্ধন ভোজন গান
ছাতাভাত্যা এড়াইল তথি।।''[২৭]

এবং গৌড় থেকে ফেরার সময় —

''গৌড়েশ্বরী প্রণমিঞা গঙ্গাপুর হইল পার।
গঙ্গাস্নান করিঞা করিল ফলাহার।।''[২৮]

এই মোড়গ্রাম ও ছেতেভেতে বিল মালদহে অবস্থিত। কেন না কবি সম্বন্ধে রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— ''গৌড়ের নিকটবর্ত্তী লোক না হইলে মোড়গ্রাম, ছেতেভেতের বিল ও গৌড়েশ্বরীর নাম জানার সম্ভাবনা ছিল না।''[২৯]

ধনপতি সিংহল রাজের দ্বারা বন্দী হয়। বহু বছর পর শ্রীমন্ত পিতাকে উদ্ধারের জন্য উজানী নগর থেকে একই পথে নৌকায় দক্ষিণ পাটন বা সিংহলে যাত্রা করে। সেই যাত্রাপথের বর্ণনা করেছেন কবি এই ভাবে—

''সপ্তডিঙ্গা মেলিলেন ভোমরার নীরে।
সারি গাইয়া জায় গাভর সকলে।।
ভোমরা লইল সাধু পাছ করিয়া।
শিবাই নদী উদয়গঙ্গা উত্তরিল গিয়া।।
শিবাই নদী লইল সাধু পাছ করিয়া।
গোপ্তগঙ্গা সদাগর উত্তরিল গিয়া।।
গোপ্তগঙ্গা লইল সাধু পাছ করিয়া।
ভীমঘাটা কুমারপুর উত্তরিল গিয়া।।

চেচায় গাভরগণ হাতে লইয়া সাট।
ডাহিনে বগাইচণ্ডী কোদালিয়া ঘাট।।
বামদিকে হালিম শহর ডাহিনে ত্রিবেনী।
জাত্রাকালে কোলাহল কিছুই না শুনি।।
গঙ্গাতীরে সদাগর দিল দরশন।
নৌকা খেওয়াইল করি দুর্গাকে স্মরণ।।
গঙ্গা ভাগরথী সাধু পাছু করিয়া।
নগর ইন্দ্রানী সাধু উত্তরিল গিয়া।।''[৩০]

এবং বলা হয়েছে— ''ধন্য২ নগর ইন্দ্রানী।
গঙ্গার কুলতে গ্রাম ইন্দ্রানী যাহার নাম
কণ্ডার তত্ত্ব সর্ব্বলোকে জানে।।''[৩১]

শ্রীমন্তের যাত্রা পথে স্থান ও নদীগুলির নাম ক্রমান্বয়ে ভ্রমরা নদী, শিবাই নদী, উদয়গঙ্গা, গোপ্তগঙ্গা (সম্ভবত মালদহ জেলার কাঞ্চন শহরের মরাগঙ্গার প্রাচীন নাম), ভীমঘাটা, কুমারপুর (ইংলিশ বাজার থানার একটি গ্রাম), বগাই চণ্ডী, কোদালিয়ার ঘাট (হুগলী জেলার ত্রিবেণীর কাছে কোন একটি অপরিচিত ঘাট) ইত্যাদি। এর প্রমাণ পাই বাংলা দেব-দেবী, সংখ্যাতত্ত্ব, মুসলমান ধর্মের গবেষক ও সংখ্যাতত্ত্বে পদ্মশ্রী প্রাপ্ত যতীন্দ্রমোহন দত্তের (১০ শ্রাবণ, ১৩০১—৭ আশ্বিন, ১৩৮২) কথায় — ''উড়িষ্যার শেষ গজপতি মুকুন্দ হরিনারায়ণ দে ত্রিবেণী অবধি জয় করেন ও ঐখানে একটি ঘাট তৈরী করেন।''[৩২] হালিমশহর, তার ডান দিকে ত্রিবেণী (হুগলী জেলায়), গঙ্গা ভাগীরথী (মালদহের সাদুল্লাপুরের মহাশ্মশানের পাশে মরাগঙ্গা ভাগীরথী নামে প্রবাহিত, তার নাম হয়ত কবি এক সঙ্গে গঙ্গাভাগীরথী বলেছেন) অতিক্রম করে ইন্দ্রানী নগরে পৌঁছায়। ইন্দ্রানী, ধুরাইচুরাই, নদীয়া, সপ্তগ্রাম, গোপ্তপাড়া — এগুলি বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার প্রখ্যাত স্থানের নাম।

এছাড়া দেবীকে রণচণ্ডী বা দ্বারবাসিনী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দেবীর এরূপ নাম গৌড়ে প্রচলিত। এই কথার সমর্থনে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর কথায় বলা যায়— ''অদ্যাপি চণ্ডীপুর গ্রামে রণচণ্ডী বা দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দিরের বিশাল ভগ্নস্তুপ পড়িয়া আছে। দ্বারবাসিনী গৌড়ের নিকটবর্ত্তিনী।''[৩৩] এবং হরিদাস পালিত বলেছেন— ''কবির ভাষা ও বর্ষা বর্ণনা মালদহের উপযুক্ত হইয়াছে।

''ঘরে পাছে আইল পানি, ছাল্যা পুল্যা পানি ছেচে
জুলি কাটিঞা থোক পুতি।''

সুতরাং এই প্রকার ভাষা ও বর্ষা-বর্ণনা দেখিয়া মানিক দত্ত যে মালদহের লোক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি।''[৩৪]

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিবাহের লোকাচার থেকেও কবিকে মালদহের বলে প্রমাণ করা যায়। তাঁর কাব্যে হর-গৌরীর বিবাহের সময় মেনকা ও খুল্লনার বিবাহের সময় রম্ভা 'আইয়' গণ নিয়ে প্রতি ঘরে ঘরে জল সাধতে যায়। সকলে আনন্দিত হয়ে জলসাধার গান গায়। মানিক দত্তের কাব্যে এই জলসাধার গানের সঙ্গে মালদহের প্রচলিত জলসাধার গানের হুবহু মিল আছে।

''প্রথমে সাধেন জল ব্রাহ্মণের বাড়ি।
নেহ গুয়া খাও পান দেহ জলের ঝারি।।
তাহা দিয়া সাজে জল কুম্ভকারের বাড়ি।
নেহ গুয়া খাও পান দেহ জলের ঝারি।।
তাহা দিয়া সাধে জল কর্ম্মকারের বাড়ি।
নেহ গুয়া খাও পান দেহ জলের ঝারি।।
তদপরে সাধে জল বণিকের বাড়ি।
নেহ গুয়া খাও পান দেহ জলের ঝারি।।''[৩৫]

এই গানের সঙ্গে ফণী পালের সংগৃহীত মালদহের জলসাধার গানের মিল লক্ষ্য করা যায়।

''সাজিয়া জল সাধেরে
ওরে মোর সালবাসের রানী না রে—
গেলাম ব্রাহ্মণের বাড়ি তারে দিলাম পান শুপারী
শুভক্ষণে ব্রাহ্মণী নিলে জলের ঝারি না রে—
গেলাম কায়স্থের বাড়ি তারে দিলাম পান শুপারী
শুভক্ষণে কায়স্থের মেয়ে নিলে জলের ঝারি না রে
গেলাম মহাজনের বাড়ি তারে দিলাম পান শুপারী
শুভক্ষণে মহাজনের নারী নিলে জলের ঝারি না রে।''[৩৬]

(জল সাধার গান)

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব ভিক্ষা করতে যায় কোচদের বাড়ি। তার বর্ণনা এরূপ—

''শিব ভ্রমে উজান ভাটী চৌদিকে কোচের বাটী
কোচ বধু ভিক্ষা দিল থালে।''[৩৭]

এই কোচ জাতির সম্বন্ধে কালীপদ লাহিড়ী বলেছেন— ''কোচজাতি গৌড়ের প্রাচীন অধিবাসী। এই জাতি রাইহোরাণী দেবীর বেদী প্রতিষ্ঠা করে। এখানে পূজায় নিবেদিত ছাগ, মহিষ বলি করা

কোচ ভিন্ন অন্য জাতির অধিকার বহির্ভূত।''[৩৮]

সুতরাং আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কবি মানিক দত্ত মালদহ জেলার অধিবাসী ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল মালদহ জেলার কোথায় তাঁর বাসভূমি ছিল? কবি কলিঙ্গ রাজের কাছে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেন তাঁর বাড়ি প্রফুল্লনগর।

''রাজা বোলে মানিক দত্ত কোন দেশে ঘর।
দত্ত বোলে আমার বাড়ি প্রফুল্লনগর।।''[৩৯]

আবার কাব্যের 'দেবখণ্ড'এর বোলম অংশে পদ্মা চণ্ডীকে মর্ত্যে তাঁর মাহাত্ম্যগীত প্রচারের জন্য ফুলফুল্যানগরের অধিবাসী কানা খোঁড়া মানিক দত্তের কথা বলেন।

''পদ্মা বোলে শুন মা সর্ব্বমঙ্গল।
মানিক দত্ত কানা খোড়া ফুলফুল্যানগর।।''[৪০]

'প্রফুল্লনগর' বা 'ফুলফুল্যানগর' কোথায় অবস্থিত? অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ''এই ফুলফুল্যানগর আসলে মালদহের 'ফুলবাড়ি' গ্রাম।''[৪১] কাজেই মানিক দত্তের নিবাস ছিল মালদহ জেলার ফুলবাড়ি নগরে। তবে উল্লেখযোগ্য যে, মালদহ জেলায় একাধিক ফুলবাড়ি নামক গ্রামের অস্তিত্ব রয়েছে। সেগুলি হল —

(ক) মালদহ শহরে পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মহানন্দা তীরবর্তী ফুলবাড়ি।

(খ) এই শহরের ৪/৫ কিমি দক্ষিণে সুস্তানি মোড়ের পূর্বদিকে অবস্থিত ফুলবাড়ি।

(গ) মালদহ শহরের ১০/১২ কিমি পশ্চিমে মালদহ-মানিকচক রাজসড়কের পাশে নঘরিয়া ফুলবাড়ি বা ফুলবাড়িয়া।

(ঘ) সাগর দিঘীর উত্তর-পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত ফুলবাড়ি।

(ঙ) গৌড়ের রাজপ্রসাদের ১$^{১}/_{২}$—২ কিমি উত্তরে ফুলবাড়ি মৌজা নামাঙ্কিত ফুলবাড়ি।

প্রথম দুটি ফুলবাড়ি মানিক দত্তের বাসস্থান কোনক্রমেই হতে পারে না। কারণ এই দুটি ফুলবাড়ি অত্যধিক অর্বাচীন। অন্যদিকে, কাব্যের আভ্যন্তরীন উপাদানের সঙ্গে এই দুটি গ্রামের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর নঘরিয়া ফুলবাড়িতে কবির বাসস্থান বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কারণ নঘরিয়া কালিমন্দির নদী ভাঙনের ফলে মানুষ নদীরপাশে ফুলবাড়িয়া নামক স্থানে নতুন বসবাস শুরু করে। তাই মনে হয় এই গ্রামটি ৫০০ বছরের পুরনো হতে পারে না।

সুনীলকুমার ওঝা তাঁর মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কমলাবাড়ির পার্শ্ববর্তী সাগর দিঘীর উত্তর-পশ্চিম পাড়ে একটি গ্রামকে কবির জন্মস্থান ফুলবাড়ি বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন—

''... মালদহ হইতে প্রায় মাইল চারেক দক্ষিণে জাতীয় সড়ক ধরিয়া গৌড় অভিমুখে চলিতে থাকিলে যদুপুর ফুলবাড়ী নামক একটি জায়গা পড়ে। সেইস্থান হইতে সদুল্লাপুর মহাশ্মশান যাওয়ার রাস্তা আছে। ঐ রাস্তার প্রবেশমুখকে ফুলওয়ারী গেট বলা হয়।... অনুমান করা চলে যে ফুলুয়ানগরের নাম অনুযায়ী ফুলওয়ারী গেট নামকরণ পরবর্তীতে হইয়া থাকিতে পারে এবং মানিক দত্তের মধ্যে যে সব স্থান, দেবস্থান ও নদনদীর নাম পাওয়া যায় সেসব ঐ এলাকার চারিপাশ দিয়াই অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মানিক দত্ত ফুলওয়ারী গেট হইতে এক মাইল পশ্চিমে যে গ্রাম বা নগর ছিল সেই গ্রামেই বা নগরেই জন্মিয়াছিলেন।''[৪২] আবার ওঝা নিজেই তাঁর বিশ্বাসকে অনুমান নির্ভর বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন— ''সাগরদিঘীরই উত্তর-পশ্চিম পাড়ে ছিল নাকি ফুলুয়ানগর— অবশ্য ইহা জনপ্রবাদ এবং কোন ঐতিহাসিক সূত্র-এর সমর্থনে মেলেনা।''[৪৩] খান সাহেব মহম্মদ আবিদ আলি খানের 'Memoirs of Gaur and Pandua' গ্রন্থের ৪০ নং পাতায় গৌড়ের ম্যাপে ফুলওয়ারী গেট রয়েছে। মনে হয় এই ফুলওয়ারীর একমাইল পশ্চিমে ফুলবাড়ি নামক নগর ছিল। কিন্তু ঐ ম্যাপে ফুলবাড়ি স্থানটি দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করছে।

এখন গৌড়ের অদূরে উত্তরে ফুলবাড়ি মৌজার নামাঙ্কিত ফুলবাড়ি গ্রাম। প্রসঙ্গত গৌড়ের শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেন বর্ধিষ্ণু হিন্দুর বসতি অঞ্চলে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। পাশেই ছিল দ্বারবাসিনী চণ্ডীমূর্তির প্রতিষ্ঠা। গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— ''দেবীর আদি মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার পরে স্থানীয় লোক কয়েকখানি ইট, পাথর রাজবাড়ীর কাছে রেখে তাকেই গৌড়েশ্বরীর স্থান জ্ঞানে পূজা করে থাকে।''[৪৪] অর্থাৎ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর কোন এক সময়ে দ্বারবাসিনীর আসল মন্দির গঙ্গার ভাঙনে পড়ে। তবে রয়ে যায় ইট, পাথর-এর গৌড়েশ্বরীর স্থান। কেননা লক্ষ্মণ সেনের পরেই মুসলমান আক্রমণে তারা নতুন করে দেবীর মন্দির তৈরী করতে পারেন নি। আমাদের এইরূপ ধারণার কারণ হল খান সাহেব মহম্মদ আবিদ আলি খান তাঁর বিবরণে দ্বারবাসিনী চণ্ডীকেই গৌড়েশ্বরী বলে উল্লেখ করেছেন— "A further point to be noticed is that at Kamalabari, which is situated a mile to the north-west of the Sagar Dighi, — the great tank which appears to have been the site of one of the earliest Hindu settlements — the Patron Goddess of Gaur, Gaureswari Devi, was still worshipped in Cunningham's time, and a fair held in her honour in the month of June."[৪৫] গৌড়েশ্বরীর প্রায় ১$^{১}/_{২}$ মাইল উত্তরে ফুলবাড়ি মৌজা নামাঙ্কিত পশ্চিম দিক গৌরীগঙ্গা ও বাকি তিনদিক গড় (বাঁধ) দিয়ে ঘেরা। এখানে পাওয়া যায় প্রাচীন

দালানবাড়ির চিহ্ন এবং পাশের টিলাগুলিতে ছড়ানো ছিটানো পাথর রয়েছে, যা পুরনো দিনের ভীতের নির্দেশ করে। খান সাহেব মহম্মদ আবিদ আলি খান এই পুরনো স্থানকেই উত্তর ফুলবাড়ি বলে নির্দেশ করেছেন— "The high land north of the great Sagar Dighi is supposed to have been the commercial town. It was protected on the east by an embankment connecting the Duarbashini Gate with the Phulwari Gate."[৪৬] সুকুমার সেন মহাশয় 'নগর' প্রসঙ্গে বলেছেন— ''প্রাচীন কালে নগর বলতে পাথরের বা ইটের তৈরী গৃহ সংবলিত ধনী অথবা রাজার বা দেবতা অধিষ্ঠিত প্রাচীর ঘেরা গ্রামকেই বোঝাত।''[৪৭] 'বাড়ি' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, ''বেড়া দেওয়া অথবা পাঁচিল ঘেরা স্থান।''[৪৮] গৌড়ের অদূরে এই স্থানটির নামকরণে নগর বা বাড়ি শব্দ দুটির প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া যায়। এই অর্থে ফুলবাড়ি ধনী বা রাজা অধিষ্ঠিত প্রাচীর ঘেরা গ্রাম। অন্যদিকে স্থানটিকে কবির জন্মস্থান বলে ধরে নিলে কাব্যে বর্ণিত স্থান, দেবস্থান, নদ-নদীগুলি পাশ্ববর্তী অঞ্চলে হয়ে থাকবে। হরিদাস পালিত বলেছেন— ''পুরাতন মালদহের নিকটবর্ত্তী কোন ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন গ্রামাদিতে তাঁহার নিবাস ছিল। ''ফুলুরা নগর'' এই স্থানের নিকটে ছিল বলিয়া মনে হয়।''[৪৯] তাই আমাদের মনে হয়, চণ্ডীমঙ্গলের কবি মানিক দত্তের জন্মস্থান ছিল গৌড়ের অদূরে উত্তর ফুলবাড়ি নামক গ্রামে।

অতঃপর মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে আসা যাক। মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মতো তিনি রচনাকাল-জ্ঞাপক কোন সংকেত কাব্যে প্রকাশ করেন নি। তার ফলে কবির কাব্যের রচনাকাল নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে দুটি মতের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন— মানিক দত্ত চৈতন্য পরবর্তী, আবার কেউ কেউ বলেছেন— মানিক দত্ত চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের কবি। প্রথমে যেসকল বিদগ্ধ সমালোচক তাঁকে চৈতন্য পরবর্তী বলতে চান তাঁদের মতগুলি তুলে ধরব।

সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন— ''মানিক দত্তের রচনার সব পুথিই অর্বাচীন, কোনটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে লেখা নয়, অধিকাংশ পুথিই নিতান্ত খণ্ডিত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখা।''[৫০] আশুতোষ ভট্টাচার্য মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চৈতন্যবন্দনা ও কিছু অর্বাচীন শব্দ লক্ষ্য করে বলেছেন— ''পুঁথিখানি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ইহাতে কালকেতুর নগর পত্তন উপলক্ষে 'ফিরিঙ্গি' শব্দেরও উল্লেখ আছে।''[৫১]

উক্ত দুই বিদগ্ধ সমালোচক মূলতঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংরক্ষিত খণ্ডিত ও প্রক্ষিপ্ত পুথির ভিত্তিতে কবি মানিক দত্তকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কবি বলে মন্তব্য করেছেন। একথা স্মরণে রেখে বলতে পারি— প্রক্ষিপ্ত পুথিতে অর্বাচীন শব্দের অনুপ্রবেশ হওয়া স্বাভাবিক। সুনীলকুমার ওঝার সম্পাদিত গ্রন্থে 'চৈতন্য প্রসঙ্গ'কে প্রক্ষিপ্ত বলা

হয়েছে।[৫২] কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুথিতে চৈতন্য প্রসঙ্গ রয়েছে। উপরন্তু মানিক দত্তের কাব্যে যে আধুনিক 'ফিরিঙ্গী' শব্দের ভিত্তিতে অর্বাচীন বলা হচ্ছে, ঠিক একই যুক্তিতে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যকে পাঁচটি বিদেশী শব্দের জন্য আধুনিক কাব্য বলতে হয়।

এবার আমরা এই মতের উল্টো দিকের মতগুলি লিপিবদ্ধ করে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে আমাদের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য দিয়ে এই বিষয়ে প্রবেশ করব। তিনি বলেছেন— ''তাঁহার পুঁথিতে প্রচুর হস্তক্ষেপ ঘটিলেও কবি যে মুকুন্দরামের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (পুঁথিতে চৈতন্যের উল্লেখ থাকিলেও), উপস্থিত ক্ষেত্রে শুধু একটুকুই অনুমিত হইতে পারে।''[৫৩]

সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৩৮) বলেছেন— ''মানিক দত্ত প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা, তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন।''[৫৪]

মধ্যযুগের সুগবেষক ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার গোপাল হালদার (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২—১৯৬২) অনুমান করে বলেছেন— ''চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম রচয়িতা ছিলেন মানিক দত্ত; — সম্ভবত মধ্যযুগেরই প্রাক্-চৈতন্য পর্বের লোক।''[৫৫]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ভূদেব চৌধুরী মনে করেন যে, মানিক দত্ত মুকুন্দ পূর্ববর্তী কবি। তাঁর কথায়— ''মানিক দত্ত যে তার পূর্ববর্তী কালের লেখক, একথা মনে করা যেতে পারে। ... মানিক দত্তকে আলোচ্য চৈতন্য পূর্ব যুগের অন্তর্ভুক্ত করছি।''[৫৬]

মধ্যযুগের সাহিত্যে সুগবেষক ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার দীনেশ চন্দ্র সেন (৩ নভেম্বর, ১৮৬৬ — ২০ নভেম্বর, ১৯৩৯) বলেছেন— "Manick Dutta refers to the flourishing condition of this temple which must have belonged to an age not earlier than the 13th century."[৫৭]

মধ্যযুগের সাহিত্য-গবেষক তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্তের (৭ আগষ্ট, ১৮৯২ — ?) কথায়— "The earliest poet on Mangal Chandi, yet know to us was Manik Datta who flourished probably in the 13th century. If Dwija Janardana flourished in the same century it is probable that his diction was changed by some later poet... The earliest works dedicated to Mangal Chandi were short but they gradually developed at the hands of later writers and become so eleborate that it took eight night to be sung — a fact mentioned in Chaitanya Bhagavata, accounting for the designation of 'A Slamangata' that the poem has since

borne."[৫৮]

অন্যদিকে, মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ক বিদগ্ধ পণ্ডিত শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৭ মার্চ, ১৯১১—২১ জুলাই, ১৯৬৪) বলেছেন— "In the Chandi Mangalas of Bengal we find almost a similar conception of Manik Datta, who flourished in or before the fifteenth century."[৫৯]

গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন— ''মানিক দত্ত মুকুন্দরাম অপেক্ষা প্রাচীন।''[৬০]

এই সকল বিদগ্ধ পণ্ডিতের উক্তিকে সামনে রেখে আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকালের সদুত্তর খুঁজব। প্রথমত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সূচনা হয়েছে 'সৃষ্টিতত্ত্ব' দিয়ে। ঠিক অনুরূপ রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' কাব্যটিও। উভয়ের কাব্যে হুবহু মিল রয়েছে। হরিদাস পালিত বলেছেন— ''সেই পূর্ব্বকালে মালদহে যে শূন্যপুরাণীয় বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল; তাহার নিদর্শন এদেশের প্রাচীন পুথি।''[৬১] ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' কাব্যে রচনা কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে— ''শূন্যপুরাণের অভ্যন্তর সামাজিক অবস্থা বিচারে একে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা বলতে হয়, কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, এবং সর্বোপরি ভাষাতত্ত্বের বিচারে এর রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর ওদিকে যেতেই পারে না।''[৬২] এই কথার আলোকে আমরা বলতে পারি মানিক দত্তের রচনাও ষোড়শ শতাব্দীর পরে নয়।

দ্বিতীয়ত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাঠ করে মনে হয় তাঁর কাব্যটি সমকালীন পাঠক বা শ্রোতাদের কাছে প্রথম শোনা। কেননা কবি চণ্ডীমঙ্গল ধারার প্রথম কবি এবং তাঁর কাব্যের ঘটনা সম্বন্ধে প্রথমে শ্রোতারা ছিল অজ্ঞাত। সকলের কাছে ছিল তা অদ্ভুত। গায়েন মানিক দত্ত যখন চণ্ডীর গীত কলিঙ্গ নগরে প্রচার করছেন তখন সকল রাজা-প্রজার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল।

''মানিক দত্ত করি নাম বিদিত সংসারে।
শ্রবনে শুনিলাঙ মাত্র অদ্ভুত গান করে।।
অদ্ভুত পুঁথি পড়ে অনেক গায় গীত।
লোকের গেল কর্ম্মকার্জ্য মোহিলেক চিত।।''[৬৩]

এবং কবি বলেছেন—

''কার না লয় অর্থ কার না লয় ধন।
গীতে মোহিত হৈল সর্ব্বলোকের মন।।

ভাঙ্গিয়া আইসে প্রজা নাহি পায় স্থান।
পঞ্চম আলাপিয়া অদ্ভুত করে গান।।''[৬৪]

কলিঙ্গের সকল প্রজা এই গান শুনতে ব্যস্ত। এই বর্ণনা বৃন্দাবন দাসের রচিত 'চৈতণ্যভাগবত'-এ দুটি চরণ স্মরণ করিয়ে দেয়।

''কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।।
ধর্মকর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।''[৬৫]

তাই মনে হয়, চৈতন্যভাগবত রচনার প্রাক্‌কালে বাংলায় চণ্ডীমঙ্গল গীতের জাগরণ পালা শোনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সুকুমার সেনের কথায় — ''চৈতন্যভাগবত ১৪৫৭ শকাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বছর দুইয়ের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল বলা যায়।''[৬৬] তাহলে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল চৈতন্যভাগবত রচনাকালের আগে রচনা হওয়া সম্ভব।

তৃতীয়ত, 'আখেটিক খণ্ডে' কালকেতু বনে পশু শিকার করতে না পেরে 'রাম নাম' গান করতে থাকে। তা শুনে হরিণীর অবস্থা এরূপ—

''পঞ্চম আলাপিআ রাম নাম গান করে
হরিনি মঙ্গল শুনে।।''[৬৭]

কালকেতু তখন হরিণীকে দেখতে পেয়ে তাকে শরবর্ষণ করে। মারা যাওয়ার প্রাক্‌কালে হরিণী রাম নাম শুনে প্রাণ যাওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করে। রাম বাঙালীর কাছে দেবতা বা আইডিয়াল চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। আর হরিণী এখানে পশু নয়; আপামর বাঙালীর প্রতিভূ।

''তিলেক বিশ্রাম করি রাম নাম গান করো
শুনিতে জাওক পরাণ।।''[৬৮]

এই রাম নাম ব্যাপক প্রচার লাভ করে বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ বাংলায় কৃত্তিবাস অনুবাদ করার পর। তাই মানিক দত্ত চণ্ডীর কাঁচুলি নির্মাণের বর্ণনায় বলেছেন—

''ধ্যানে জানিল জদি বিনতা নন্দন।
গরুড়ে আসিয়া মৎস্য করিল ভক্ষণ।।
ইতিহাস গীত গাইতে ব্যাজ অনেক হয়ে।
সে গীত রচিয়া গাইছেন কীত্তিবাস মহাশয়ে।।''[৬৯]

কৃত্তিবাসের রামায়ণের সম্পাদক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন— ''কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনাকাল ১৩৪০ শকাব্দা বলিয়া অনুমিত হয়।''[৭০] প্রসঙ্গত সুকুমার সেন

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের ভূমিকায় সমকালের শাসক শ্রেণীর রামকথা শোনার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে একটি উদাহরণ তুলে ধরেন। তা এরূপ— ''রামকথা শুনিতে মুসলমানদের প্রবল আগ্রহ ছিল :

যেন পিতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে
নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে।
যবনেও যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে
ভজো হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে।''[৭১]

তাই মনে হয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এরূপ আবহাওয়ায় রচিত হয়ে থাকবে।

চতুর্থত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডে শিবের বিবাহে গঙ্গার রন্ধন প্রসঙ্গ মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীন কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যের অনুরূপ। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে সুকুমার সেন বলেছেন ''১৪১৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৫-৯৬ অব্দে এই কাব্য লেখা হইল।''[৭২] মনসামঙ্গল কাব্যের পর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সাহিত্যাঙ্গনে ভূমিষ্ঠ হয়।

পঞ্চমত, ধনপতির সিংহল রাজ শালবান কর্তৃক বন্দী হলে আক্ষেপ করে যে কথাটি বলে তাতে চৈতন্যের (১৪৮৬ — ১৫৩৩) প্রেমনাম লিখিত পোষকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধনপতি বলে—

''জোগী বা সন্ন্যাসী হৈব প্রেমের কেথা গলে দিব
মাগি খাইতে জাব উজয়ানি।।''[৭৩]

দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য বলেছেন— ''মুকুন্দরাম মানিক দত্ত নামে জনৈক কবিকে চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মানিক দত্তের প্রদর্শিত পথেই মুকুন্দরাম অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই উভয় কাহিনীই মানিক দত্তের কাব্যে স্থানলাভ না করিলে মুকুন্দরাম কর্ত্তৃক অনুকরণের এই স্বীকৃতি নিরর্থক হইয়া পড়ে।''[৭৪] যদিও সুকুমার সেন মুকুন্দ চক্রবর্তীর রচনাকাল সম্বন্ধে বলেছেন— ''... কাব্যরচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।''[৭৫] এছাড়া মুকুন্দ চক্রবর্তী নিজেই তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—

''রাত্রি দিবা তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নৌতন মঙ্গল অভিলাষে।''[৭৬]

'নৌতন' তখনই বলা হয় যখন তাঁর কাছে পুরাতন কিছু থাকে। তাই মনে হয় মানিক দত্তের কাব্য তাঁর কাছে পুরাতন বলে মনে হয়েছে। এ সম্পর্কে সুকুমার সেন-এর মন্তব্য প্রযোজ্য— ''মুকুন্দ তাঁহার রচনাকে বার বার বলিয়াছেন ''নৌতন মঙ্গল'' অর্থাৎ নূতন পাঞ্চালী কাব্য। ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। এক, প্রথম রচিত চণ্ডীমঙ্গল; দুই, নূতন ধরনের চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দই যে চণ্ডীর

মাহাত্ম্য বর্ণিবার জন্য সর্বপ্রথম কালকেতু-ধনপতির কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন এমন কথা বলিবার পক্ষে একটু বাধার মতো আছে। একটি পুথিতে নাকি পূর্বগামী লেখক মানিক দত্তের উল্লেখ আছে। পাঠটি এই,

মানিক-দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ

এখানে ''মানিক দত্তের দাণ্ডার'' অর্থ আসলে কিন্তু মানিক দত্ত সম্পর্কিত কাহিনী।''[৭৭] যেমন ভাবে ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে 'নূতন মঙ্গল' বলেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্র মৌখিক উপাদানকে তাঁদের প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিল্পরূপ দিয়েছেন। একথা বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন— ''... যে বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা একটা লিখিত আদর্শও লাভ করিয়াছিল। যেমন মুকুন্দরামের আদর্শ ছিল মানিক দত্ত এবং ভারতচন্দ্রেরও আদর্শ ছিল মুকুন্দরাম।''[৭৮] তাই মনে হয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি ১৪৯৫ — ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোন এক সময়ের লেখা হয়ে থাকবে।

তবে মানিক দত্তের জন্মকাল সম্পর্কে কোন হদিস বা তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর গোত্র বা বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। তাঁর চণ্ডীর গীতের প্রতি ভক্তি ছিল। সেই ভক্তির জোয়ারে তিনি চণ্ডীমঙ্গল গীত করতে বেরিয়ে পড়েন। তিনি সুকবি না হলেও গায়েন ও ভক্ত কবি বটে। এই প্রকৃতির এবং চণ্ডীমঙ্গল ধারার প্রথম কবি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী কীভাবে গ্রন্থিত হয়েছে তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্র :

১। পঞ্চানন মণ্ডল ভূমিকা ও সম্পাদনা; চণ্ডীমঙ্গল মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত, ভারবি, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯৯, পৃ. ৫।

২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৪।

৩। তদেব, পৃ. ৩৫।

৪। হরিদাস পালিত; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৭, পৃ. ২৪৮।

৫। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪৫৭।

৬। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ (খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩-১৬০৫ অব্দ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১০-২০১১, পৃ. ৯১।

৭। সনৎকুমার মিত্র; পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ, স্নানযাত্রা, আষাঢ়, ১৩৮২, পৃ. ১৮৬।

৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৩৮৪।

৯। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৫৩।

১০। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ২৭৭।

১১। ভূদেব চৌধুরী; বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ. ২০১।

১২। B. Ray (Edit); Alphabetical list of villages and towns, District Census Hand Book, Malda, 1961, p. 277.

১৩। Id; p. 279.

১৪। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪১।

১৫। B. Ray (Edit); Alphabetical list of villages and towns, District Census Hand Book, Malda, 1961, p. 291.

১৬। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; ভূমিকা, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৮।

১৭। B. Ray (Edit); Alphabetical list of villages and towns, District Census Hand Book, Malda, 1961, p. 253.

১৮। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; ভূমিকা, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৮।

১৯। L.S.S.O' Malley; Bengal District Gazetteers Mursidabad, Government of West Bengal, First Reprint, May, 1997, P. 207.

২০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; ভূমিকা, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৮-৪৯।

২১। Bhaskar Ghose (Edit); Alphabetical list of villages and towns, District Census Hand Book, Murshidabad, 1971, p. 6.

২২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২০৭।

২৩। বিনয় ঘোষ; পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৫৭, পৃ. ২৬৫।

২৪। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সম্পাদক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৪।

২৫। তদেব; পৃ. ৩১১।

২৬। B. Ray (Edit); Alphabetical list of villages and towns, District Census Hand Book, Malda, 1961, p. 253.

২৭। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংখ্যা, একাদশ ভাগ, ১৩১১, পৃ. ৩৪।

২৮। তদেব।

২৯। তদেব।

৩০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৯৮।

৩১। তদেব।

৩২। যতীন্দ্রমোহন দত্ত; কালকেতুর উপাখ্যান কবিকল্পনা না জনশ্রুতির অনুসরণ?, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, ষষ্ঠ বর্ষ, মাঘ, ১৩৭৪, পৃ. ২১।

৩৩। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংখ্যা, একাদশ ভাগ, ১৩১১, পৃ. ৩৪।

৩৪। হরিদাস পালিত; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৭, পৃ. ২৪৯।

৩৫। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ.২০৭।

৩৬। ফণী পাল; প্রান্তিক মালদহ জেলার কতিপয় বিয়ের গান, উত্তরবঙ্গের লোকগান, সম্পাদক রতন বিশ্বাস, বইওয়ালা, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ, ১৪১৬, পৃ. ২২৬।

৩৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৬।

৩৮। কালীপদ লাহিড়ী; গৌড় ও পাণ্ডুয়া, মালদহ সমবায় মুদ্রণী লি:, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৬৮, পৃ. ৪৩।

৩৯। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৬।

৪০। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৩।

৪১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৮-০৯, পৃ. ১৪১।

৪২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৪৬।

৪৩। তদেব।

৪৪। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯,পৃ. ১২৫।

৪৫। M. Abid Ali Khan; Memoirs of Gaur and Pandua, Bengal Secretariat Book Depot, Writer's Buildings, Kolkata, 25 Oct., 1924, P. 41.

৪৬। Id.; P. 42.

৪৭। সুকুমার সেন; বাংলা স্থান-নাম, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৪০০, পৃ. ২০।

৪৮। তদেব, পৃ. ২১।

৪৯। হরিদাস পালিত; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৭, পৃ. ২৪৮।

৫০। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪৪৯।

৫১। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৩৮০।

৫২। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; ভূমিকা, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৫৭।

৫৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতন্যযুগ (খ্রী: ১৪৯৩-১৬০৫ অব্দ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১, পৃ. ৯১।

৫৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী (চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী), প্রথম ভাগ, সম্পাদক তরুণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, সাহিত্যলোক সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০৭, পৃ. ১৭৬।

৫৫। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ

মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ১১৩।

৫৬। ভূদেব চৌধুরী; বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ. ২০০-২০১।

৫৭। Dinesh Chandra Sen; History of Bengali Language and Literature, Gian Publishing House, Delhi, First Reprint, 1986, p. 334.

৫৮। Tamonash Chandra Das Gupta; Mukundaram and other poets of the Chandi-Cult, studies old Bengali Literature, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৮, পৃ. ২৯।

৫৯। Shashibhusan Das Gupta; Obscure Riligious Cults, Firma KLM Private Limited, Calcutta, Reprint, 1995, p. 318.

৬০। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংখ্যা, একাদশ ভাগ, ১৩১১, পৃ. ৩৫।

৬১। হরিদাস পালিত; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৭, পৃ. ২৫৩।

৬২। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত; রামাইপণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ, ফার্মা কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ১৩-১৪।

৬৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩৬।

৬৪। তদেব; পৃ. ৩৫।

৬৫। সুকুমার সেন সম্পাদিত; আদিখণ্ড, চৈতন্যভাগবত (দ্বিতীয় অধ্যায়), বৃন্দাবন দাস বিরচিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ৬।

৬৬। তবেদ; পৃ. ৩।

৬৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৬৯।

৬৮। তদেব; পৃ. ৭০।

৬৯। তদেব; পৃ. ৮৫।

৭০। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা সম্বলিত; রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, পুনর্মুদ্রণ, জুন ১৯৮৩, পৃ. ।

৭১। সুকুমার সেন সম্পাদিত; ভূমিকা, চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয়

মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ৭।

৭২। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ১৬১।

৭৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৭৮।

৭৪। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫২, পৃ. ।

৭৫। সুকুমার সেন সম্পাদিত; ভূমিকা, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৩।

৭৬। তদেব; পৃ. ৪০।

৭৭। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪৪৫।

৭৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১০৯।

——oo——